মাতৃপ্রসঙ্গ

সারদা সরস্বতী

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদা দেবীর প্রসঙ্গে এমনই একটি বাক্যবন্ধ প্রয়োগ করে তাঁর দিব্য পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন : ''ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।'' আরও বলেছেন, এবার শ্রীমা রূপ ঢেকে এসেছেন, রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে মানুষের অকল্যাণ হয়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক কোন অর্থে এই বাক্যগুলি প্রয়োগ করেছেন। কারণ শ্রীমাকে তো তাঁর মতন অধ্যাত্মউপদেশ দিতে দেখা যায়নি! যে-কয়েকজন মহিলাভক্ত তৎকালে প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতেন—গোলাপ মা, যোগীন মা, গৌরী মা, গোপালের মা বা বলরামবাবু প্রভৃতির স্ত্রীরা, তাঁরা প্রধানত শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণেই দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, এবং পুরুষ ভক্তেরা না থাকলে বসে তাঁরই কথা শুনতেন। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁদের শ্রীমার কাছে পাঠাতেন—পরিচিত হওয়ার জন্য বা প্রসাদ নেওয়ার জন্য। পরে গোলাপ মা ও যোগীন মা শ্রীমার সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন ও কিছু কাজকর্মে সহায়তা করতেন। কিন্তু শ্রীমা তাঁদের সঙ্গে বসে ধর্মালাপ করেছেন, এমন কথা স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখিত শ্রীমায়ের জীবনীগ্রন্থে—যেটি সর্বাপেক্ষা authentic বা আকরগ্রন্থ বলে মনে করি—তাতে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে শ্রীমা নিভৃতচারিণীই ছিলেন, তাঁর পবিত্র কল্যাণময় অবয়ব দু-চার জন ভক্তমহিলা ও দু-একজন বালকভক্ত ছাড়া বাইরের কেউই দৃষ্টিগোচর করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে জ্ঞানদানের কথা তো ভাবাই যায় না।

দ্বিতীয়ত এই প্রসঙ্গে মনে হয় যে, সরস্বতী জ্ঞানের বা বিদ্যার দেবী বলে যে-ধারণা প্রচলিত আছে, রামকৃষ্ণদেব তাকেই মান্যতা দিয়ে ওইকথা বলেছেন কি না। বেদে সরস্বতী নদীমাত্র, অবশ্য ব্রাহ্মণসাহিত্যে সরস্বতী ও বাক্ অভিন্না হয়েছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মেধাস্তুতিতে দেবী সরস্বতীর কাছে মেধা প্রার্থনা করা হয়েছে। অতএব তখনই তিনি জ্ঞানের দেবী বলে স্বীকৃত। কেনোপনিষদে ব্রহ্মশক্তি 'বহুশোভমানা উমা হৈমবতী'-র কথা আছে, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে আবির্ভূত হয়ে যক্ষরূপী ব্রহ্মের পরিচয় দিয়ে জানিয়েছিলেন, দেবতাদের অসুরবিজয় ব্রহ্মেরই শক্তিতে—তা দেবতাদের নিজস্ব কৃতিত্ব নয়। এই গুরুরূপী ব্রহ্মশক্তির কাছ থেকেই ইন্দ্রাদি দেবতা জ্ঞানলাভ করলেন। তিনি কিন্তু এখানে ব্রহ্মজ্ঞানদাত্রী সরস্বতীরূপে বর্ণিত হননি। তবে এর পরে আমরা

পুরাণের যুগে জ্ঞানের, বিদ্যার দেবীরূপে সরস্বতীর কথা পাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর বর্ণনা রয়েছে। অসুরবধের অনুষঙ্গে যেমন তামসিক ও রাজসিক—যথাক্রমে মহাকালী ও মহালক্ষ্মী এসেছেন, তেমনই নারায়ণীস্তুতিতে সত্ত্বগুণময়ী সরস্বতীকে ''মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে''—এইভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক—এই তিনটি স্তর মানবজীবনে উত্তরণের ক্রম বলেই চিহ্নিত। কিন্তু এখানে দেবী সরস্বতীকে ''আপনি মেধারূপা, বাগ্‌দেবী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, দৈবশক্তি ও ঈশ্বরী''—এই সবকিছুরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী—একই জগৎকারণ, সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তিরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। পৃথকভাবে তাঁকে জ্ঞান ও বিদ্যার দেবীরূপে দেখানো হয়নি। তাই প্রশ্ন জাগে, ঠিক কখন থেকে দেবী সরস্বতী জ্ঞানদাত্রীরূপে পরিচিতা হলেন।

সুদূর অতীতে জ্ঞানচর্চার স্থানটি নির্দিষ্ট ছিল সরস্বতী নদীর অববাহিকায়। জ্ঞানব্রতী তপস্বীরা তাঁকে স্তবে বলেছেন, ''নদীতমে দেবীতমে অম্বিতমে।'' অর্থাৎ এখানে নদীর তীরবর্তী স্থানটি জ্ঞানআহরণের অনুষঙ্গে তাঁদের চিন্তায় স্থান করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী নদীটিও যেন জ্ঞানদাত্রী ও মাতৃরূপে তাঁদের মননে প্রতিভাত হয়েছে। সরস্বতী নদী গঙ্গা-যমুনার মতোই হিমালয় থেকে স্বতউৎসারিত একটি প্রসিদ্ধ স্রোতস্বিনী। তবে গঙ্গার সঙ্গে যেমন একটি দিব্যভাবনা মিশে আছে হিন্দুসমাজে, অনেক স্তবস্তুতিও রচিত হয়েছে তাকে নিয়ে, সাধুসন্ত সহ অগণিত ভারতবাসীর কাছে তা এক ধর্মীয় আবেগসৃষ্টিকারী হয়ে উঠেছে, সরস্বতী নদী সম্বন্ধে তেমনটি আমরা পাই না। এখন সে-নদীটির ধারাও বিলুপ্ত। যেন মনে হয় সেই জ্ঞানমার্গী তপস্বীগণ—যাঁরা ভালবাসায় কৃতজ্ঞতায় ওই নদীকে মাতা ও দেবী আখ্যা দিয়েছিলেন—তাঁদের যুগ শেষ হওয়ায়, সেই নদী সরস্বতীরও যেন প্রয়োজন ফুরিয়েছে এবং সেই নদীতমা অম্বিতমাও নিজেকে যেন বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু মহাকাল তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বিদ্যার দেবী সরস্বতীরূপে। নদী তো আমাদের মাতাই, আমাদের জীবনপ্রবাহ তো তারই দাক্ষিণ্যে সচল থাকে, মাতার কাছেই তো আমাদের হাতেখড়ি।

আমরা যদি মনে করে নিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রচলিত দেবীভাবনাকেই মান্যতা দিয়েছেন, তাহলেও কোনও অসংগতি থাকে না। আবার যদি মনে করি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত 'মহাসরস্বতী'র ধারণাকেই তিনি মান্যতা দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, তাহলেও কোনও বিরোধ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে 'ব্রহ্মময়ী' বলেও মাঝে মাঝে সম্বোধন করেছেন এবং বলেছেন, ''ও কি যে সে, ও আমার শক্তি।'' এই 'শক্তি' ও 'আদ্যাশক্তি'কে অভেদ দেখেই তাঁর ওই ঘোষণা—''ও সারদা—সরস্বতী''—যার মধ্যে জ্ঞান, বল, ক্রিয়া তিনেরই সমন্বয় ঘটেছে। তিনিই একাধারে কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী শক্তিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের এক শিষ্য সন্তান তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কীভাবে দেখেন। এর উত্তরে শ্রীমা জানান যে তিনি তাঁকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনরূপে দেখেন, সন্তানরূপেও দেখেন। এই দিব্য দম্পতির অ-মায়িক সম্পর্ক আমাদের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। তবে তাঁদের পরস্পরের পরিচয় প্রদান ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতেই আমরা তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করার সাহস পেয়ে থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় হৃদয় শ্রীমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা

বললে তিনি তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন, তাঁকে যা খুশি বললেও পার পাওয়া যাবে, কিন্তু শ্রীমাকে অসম্মান করে অপবাক্য বললে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না। শ্রীমাও একদিন তাঁকে অতীব জ্বালাতন করার প্রতিবাদে এভাবেই নিজের স্বরূপ নিজে ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো শিবু শ্রীমায়ের সত্যকার পরিচয় জানতে জেদ করায় শ্রীমা জানিয়েছিলেন যে তিনিই মা কালী। 'আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়'—শ্রীমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবতারিণীর সঙ্গে শ্রীমার কোনও ভেদ নেই তাঁর কাছে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী বলছেন, তাঁকেই 'কালী'রূপে চিহ্নিত করছেন এবং এর পূর্ণ সমর্থন শ্রীমার দিক থেকেও পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীমাকে ব্রাহ্মণেতর জাতির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে দেখে তাঁর ভাইঝি নলিনী ক্ষোভে বলে উঠেছিলেন, ''মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!'' শ্রীমা তৎক্ষণাৎ নির্দ্বিধায় উত্তর দেন, ''সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?'' এই মহাবাক্যটি যেন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত আদ্যাশক্তি দেবী অম্বিকার কথার প্রতিধ্বনি। ক্রুদ্ধ শুম্ভাসুরের অভিযোগ ছিল, দেবী একাকী যুদ্ধ করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু নারীকে নিয়ে যুদ্ধ করছেন। তার উত্তরে দেবী বলেন, ''একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা''—এই জগতে আমি একাই আছি, এই সকল নারীরা আমারই অভিন্ন শক্তি বা বিভূতিমাত্র। শ্রীমা নিজের সম্বন্ধে এমন উক্তিও করেছেন, ''আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।'' জগতে যত মানবসন্তান আছে, তারা হয় ভাল হবে নয় মন্দ হবে, হয় সৎপ্রকৃতির না হয় অসৎ প্রকৃতির হবে, এই dichotomy-র বাইরে কেউই পড়বে না। তাই যুক্তিসিদ্ধভাবে, বিচারের মানদণ্ডেই শ্রীমা সকলের মা হয়ে আছেন, সকলের সঙ্গেই তাঁর আত্মিক বন্ধন ও একাত্মতা।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা উভয়েই কামারপুকুরে। একদিন ঠাকুর শ্রীমাকে শুনিয়ে সন্তানসন্ততি নিয়ে সংসারজীবনের অসারতার কথা বলতে শুরু করেন—''ছেলের অন্নপ্রাশনে যে কোমরে গোট পরে নাচবে গাইবে, সেই ছেলে মরে গেলে সেই কোমর ভুঁইয়ে আছড়ে কাঁদতে হবে।'' অতএব শ্রীমা যেন সন্তানাদির বাসনা না করেন। শ্রীমা ওইকথা শুনে ঘরের ভিতর থেকেই মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলেন, ''সবগুলোই কি আর মরে যাবে?'' রামকৃষ্ণদেব সেকথা শুনেই উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন (অবশ্যই খুশি হয়ে), ''ওরে জাত সাপের ন্যাজে পা পড়েছে রে, জাত সাপের ন্যাজে পা পড়েছে।''

বলার অপেক্ষা থাকে না যে মায়ের উত্তরটি অবশ্যই একটি সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ বাণী। কারণ গার্হস্থ্যজীবনে সন্তানাদির মৃত্যু ও তজ্জনিত শোক একটি সাধারণ ঘটনা বটে, কিন্তু সকলের সব সন্তানই (সেকালে একাধিক সন্তানই থাকত) মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী, সচরাচর দেখা যায় না। একথা সত্যি হলে জগৎ চলছে কী করে! বরং শ্রীরামকৃষ্ণদেবই শ্রীমাকে সচেতন করতে গিয়ে অহেতুক জাগতিক বা ব্যাবহারিক সত্যকে অস্বীকার করেছেন, শ্রীমা সেকথাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জগৎসৃষ্টিকারিণী যিনি তিনিই যথার্থ সত্যটি জানেন। তবে প্রশ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি জানতেন না? নাকি শ্রীমার মুখ থেকে এই জ্ঞানের বার্তাটি প্রকাশিত হোক—এ তিনি চেয়েছেন, যা ইতিহাস হয়ে থাকবে ও সারদা সরস্বতীর পরিচিতি জ্ঞাপন করবে। তা নাহলে তিনিই বা কেন মায়ের প্রতিবাদে রুষ্ট না হয়ে খুশি হয়ে বলে উঠবেন, ''জাত সাপের ন্যাজে পা পড়েছে।'' শ্রীমা যে ঢোঁড়া সাপ নন—জাতসাপ, জ্ঞানহীন-শক্তিহীন নন, আপাত সংসার-অনভিজ্ঞ ওই বালিকা বয়সেই মা যে

সত্যজ্ঞানে সদা আরূঢ়া, তার প্রকাশ ঘটাতেই কি শ্রীরামকৃষ্ণ এই মিথ্যাবাক্যের খোঁচাটি দিয়ে মাকে 'ফোঁস' করালেন! জানি না কী ছিল বিধাতার মনে! তবে দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই 'সারদা সরস্বতী' তাঁর জ্ঞানের ঝাঁপিটি প্রথম খুলেছেন।

পরে যখন স্বামীসেবার জন্য শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, তখন একদিন এক মহিলা ভক্ত তাঁর কাছ থেকে ভাতের থালাটি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-কোনও ব্যক্তির স্পৃষ্ট খাবার খেতে পারেন না, একথা শ্রীমা জেনেও কেন ওই মেয়েটিকে থালাটি দিলেন, এই অনুযোগ করে শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে দিয়ে সংকল্প করাতে চাইলেন যে মা আর কোনওদিন যেন এই ভুল না করেন। তখন মা তাঁর স্বরূপসত্তাটি ব্যক্ত করেন অতি স্পষ্ট ও ঋজু ভাষায় : ''তা তো আমি পারব না ঠাকুর!... আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।'' আর একইসঙ্গে তাঁকেও সচেতন করে দেন : ''তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।'' ওই অল্পবয়স্কা কিশোরী বধূটির মুখে এই অভাবনীয়, অসাধারণ উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণকে চমৎকৃত করেছিল কি না জানা নেই, তবে এখানে শ্রীমার মাতৃত্বের মহিমা জ্ঞাপন ও তার পিছনে তাঁর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে দেয়।

স্বামী তো স্ত্রীর সর্বস্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ তবে সকলের কোন অর্থে? ভেবে নিতে বাধা নেই, শ্রীরামকৃষ্ণের যে মহৎ জীবনোদ্দেশ্য, যার জন্য তাঁর পৃথিবীতে নরশরীরে আগমন, সেই লোককল্যাণ সাধনের 'mission'-এর কথাই এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে শ্রীরামকৃষ্ণ কি সেকথা বিস্মৃত হয়েছিলেন, নাকি শ্রীমায়ের জগন্মাতৃত্ব ও জ্ঞানদাত্রী রূপটি প্রকট করার জন্য নিজেই তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন কোনও ছলে!

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ওইকালে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্র-রাখালাদি যুবকগণ বা গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ—সকলেই তাঁর প্রেমাভক্তি, ঈশ্বরতন্ময়তা, মুহুর্মুহু সমাধিমগ্নতা ইত্যাদি ভগবদ্‌ভাব দেখে তাঁর প্রতি এক অপার্থিব আকর্ষণ বোধ করেছেন ঠিকই, এবং কেউ কেউ তখনই তাঁকে ঈশ্বরকল্প পুরুষ বলেও ধারণা করেছেন, কিন্তু কেউই তাঁর জীবনের, তাঁর আগমনের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হননি, বা সে-সম্বন্ধে কোনও কথাই উচ্চারণ করেননি। এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমাই প্রথম যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 'বিরাট সত্তা'টির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন, যা জগতের দিক দিয়ে, সংসার-সমাজের দিক দিয়ে অতীব তাৎপূর্যপর্ণ। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীমার বলেই মনে করতে পারি।

মা শুধু যে রামকৃষ্ণদেবকেই তাঁর জীবনোদ্দেশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন তা নয়, পরবর্তী প্রজন্মকেও সচেতন করে দিয়েছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়নে যেন আমরা ভুল না করি, অর্থাৎ তাঁকে শুধুমাত্র একজন 'God intoxicated person' (ইশারউডের ভাষায়) বলে মনে না করে তাঁর জগতকল্যাণকারী 'mission'-কে যেন প্রাধান্য দিই—পরে যে-ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই ব্যক্ত করেছেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে। এটিই স্বামী বিবেকানন্দকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছে মানবসেবায়, যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর 'মিশন' জগৎসভায় তথা বিশ্বমানবহৃদয়ে একটি চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

শ্রীমা সারদা দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পরপরই একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ''তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?'' এর উত্তরে তৎক্ষণাৎ নির্দ্বিধায় শ্রীমা বলেন, ''না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'' এই 'ইষ্টপথ' বলতে যে তিনি

শ্রীরামকৃষ্ণের 'ইষ্টদেবী' মা কালীকে বা তাঁর পূজা-অর্চনাকে বোঝাননি, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। শ্রীমা 'ইষ্টপথ' বলতে জগতের সকলকে নিয়ে চলা ও সকলকে গ্রহণের উদার উন্মুক্ত ধর্মপথকে বুঝিয়েছিলেন—এই ভাবনারই প্রকাশ ধরতে পারি পূর্বোক্ত কথায়—''তুমি যে সকলের।'' এ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি ঠাকুর-স্বামীজীর দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা দীর্ঘকাল জীবিত থেকে তাঁদের মূল জীবনোদ্দেশ্যকে অর্থাৎ সর্বাত্মক অদ্বৈত-সত্যকে নিজ কর্মে, কথায়, আচরণে; প্রতিদিনের জীবনচর্যায় সর্বতোভাবে প্রকাশ করে গেছেন, শুধুমাত্র তীর্থভ্রমণ ও জপধ্যানে মগ্ন না থেকে—যা তৎকালে তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। শুধু তাই নয়, যে- মঠ-মিশনের 'রক্ষত্রিয়ী, পালয়ত্রী' হওয়ার দায়ভার তাঁর ওপর স্বামীজী অর্পণ করে গিয়েছিলেন তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকেই, তার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তিনি ঐকান্তিকভাবে সহায়তা করে গেছেন; একটি পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও আবিশ্ব জনসংযোগ রক্ষা করে গেছেন সানন্দে ও সপ্রেমে!

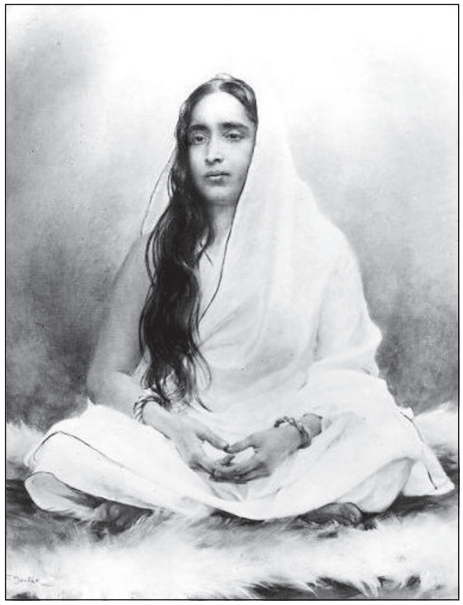

আরও কয়েকবারই রামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমার এই জ্ঞানময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। একটি পথভ্রষ্টা, সমাজপরিত্যক্তা বৃদ্ধাকে নির্জন দুপুরে শ্রীমার কাছে নহবতে প্রায়ই আসতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অখুশি হয়ে তার আসা বন্ধ করতে বলেন। শ্রীমা প্রথমদিন কোনও উত্তর দেননি। পরেও তার আসা বন্ধ হয়নি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু জোর দিয়েই শ্রীমাকে তার সঙ্গে মিশতে ও আলাপাদি করতে নিষেধ করেন। এবারে মা শান্ত ও দৃঢ়স্বরে উত্তর দেন, ''ও এখন ভাল কথাই তো কয়, হরিকথা কয়, তাতে দোষ কি?'' শ্রীমা বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি বৃদ্ধাকে সঙ্গ দিতে বিরত হবেন না এই যুক্তিতে যে, যদি একবার কেউ ভুল করে বিপথে যায়, তবে তার সংশোধনের ব্যবস্থা সমাজে থাকা উচিত; হৃদয়হীনতায় তাকে আরও অন্ধকারের পথে ঠেলে দেওয়া মানবধর্ম হতে পারে না। সর্বজনের প্রতি শ্রীমার মাতৃভাব এই মানবধর্মেরই অঙ্গীভূত বলে মনে করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যেমন বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীমাকে জ্ঞানদাত্রীর ভূমিকায় দেখি, তেমনি পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর দৈবী মেধা ও তীক্ষ্ণ যুক্তিবিচার-শীলতা নিয়েও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর কাছে হার মেনেছেন। প্লেগের সময় সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট দেখে যখন আবেগের বশে স্বামীজী মঠের জন্য কেনা জমি বিক্রি করে সেই অর্থে মানুষের সেবা করতে চাইলেন, তখন শ্রীমা নিরাবেগ যুক্তি দিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন অভিজ্ঞ আইনবিদের মতো। মা বলেছিলেন, সে-জমি ঠাকুর ও মার নামে উৎসর্গিত হয়ে গেছে কাগজে কলমে, তা বিক্রি করার অধিকার স্বামীজীর নেই। তার সঙ্গে মা মঠগঠনের আরও একটি অমোঘ তাৎপর্যের কথাও

জানান : একটিমাত্র সেবাকাজেই—তা যত অপরিহার্যই হোক—মঠের উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যেতে পারে না; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সুদীর্ঘকাল ধরে কাজ করে চলবে। এটর্নির পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমার আইনজ্ঞান ও বিবেচনার কাছে সানন্দে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার নবমীর দিন 'বলি' দেওয়ার বাসনা করেন স্বামীজী, এবং শ্রীমায়ের কাছে অনুমতি চান। শ্রীমা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন, ''... বলি দিও না, প্রাণী হত্যা কোরো না। তোমরা হলে সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।" আমরা বিস্মিত হই ভেবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই স্বামীজীকেও তাঁদের 'ব্রত' সম্বন্ধে শ্রীসারদা দেবীকে সচেতন করাতে হয়েছে।

স্বামীজী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে যে-কোনও প্রকার সাকার উপাসনা নিষেধ করেছিলেন। সেই মর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি রেখেও পূজা করা চলত না। কিন্তু স্বামীজীর শিষ্যেরা কয়েকজন এই ব্যবস্থায় বিভ্রান্ত হয়ে শ্রীমাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। এর উত্তরে শ্রীমা দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন, ''আমাদের গুরু যিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা (যখন) সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।"

এমন কথা যে শ্রীমা নিশ্চিতভাবে জানালেন তার ভিত্তি কী? প্রশ্ন উঠতে পারে, রামকৃষ্ণদেব তো সাধন শুরুই করেছিলেন কালীপূজা দিয়ে, সেই ইষ্টদেবতার দর্শন-স্পর্শনই তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল, এমনকী সব ব্যাপারে তিনি মা কালীর অনুমতি ব্যতীত একপদও অগ্রসর হতেন না। এসব তো দ্বৈতভাব সাধনেই সম্ভব। এর ওপরে আছে বিশিষ্টদ্বৈতবাদ, সেখানেও শ্রীমৎ রামানুজাচার্য সাকার উপাসনায় স্থিত ছিলেন, তাঁর মতে, 'জীব-জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম', তাই সবই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণও জানিয়েছেন : একটি বেলফল, তার খোসা, বিচি ও শাঁস—সব মিলিয়ে সত্য, শুধু শাঁসটুকুকে বেল বললে সমগ্র বেলকে বোঝানো হয় না। সুতরাং রামকৃষ্ণদেবকে শ্রীশ্রীমা 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী' বলেও চিহ্নিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেখানেই না থেমে একেবারে অদ্বৈততত্ত্বে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। একথার মর্ম অনুধাবন করতে গেলে শ্রীমৎ শংকরাচার্যের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'—'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' এই তত্ত্বে চলে আসতে হবে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে 'মিথ্যা' আখ্যা দেননি। জগতের কল্যাণের জন্যই তো তাঁর প্রিয়তম শিষ্য, ধ্যানপরায়ণ নরেন্দ্রনাথকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের 'অদ্বৈতভাব' দাঁড়ায় কোথায়?

সমাধানটি এভাবে আসতে পারে, বা বেদান্তের ঘোষণা অনুযায়ীই আসবে, যেখানে বলা হয়েছে,

''ঘটকুড্যাদিকং সর্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্‌বদ্‌ ব্রহ্ম জগৎ সর্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥"

—ঘট ও কুড্য (ঘরের দেওয়াল) সবই যেমন মৃত্তিকামাত্র, সেইরকম এই সমস্ত জগৎ এক ব্রহ্মমাত্র—এটিই বেদান্তশাস্ত্রের ঘোষণা। শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের এই ব্রহ্মভাবটিই গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দকে ঘটপটাদিতেও সেই ব্রহ্মচৈতন্য দর্শন করিয়েছিলেন। তিনি নিজেও শংকরপন্থী শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈতমতে সন্ন্যাসগ্রহণ করে সর্বভূতে এই চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ-নির্বিশেষে সকলকে, সকল বস্তুকে সেই ব্রহ্মেরই রূপ বলে গ্রহণ করেছেন। আমাদেরও নির্দেশ দিয়েছেন 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে' সব কাজ করতে, যাতে সব কর্মই ধর্মে রূপান্তরিত হয়। শ্রীশ্রীমা রামকৃষ্ণদেবের এই 'বিরাট' সত্তাকে প্রাধান্য ও গৌরব দিয়ে এমন সত্যটি

ঘোষণা করেছেন বলে মনে করা যেতেই পারে। বলা বাহুল্য যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধুমাত্র 'সাকার উপাসক' বা 'দ্বৈতবাদী' বলে মনে করে নিয়েছিলেন তাঁরা তাঁর 'নিরুপাধিক' সত্তাটি ধারণা করতে পারেননি, শুধু তাঁরাই নন, রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের তৎকালীন অনেক জ্ঞানী, বিদ্বজ্জনেরও এই জ্ঞান ছিল না। শ্রীমা সারদাই তাঁদের ও আমাদের জন্য এই জ্ঞান বিতরণ করেছেন।

শ্রীমা ছিলেন একেবারেই অন্তঃপুরচারিণী। জয়রামবাটীর অজপল্লিতে দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা, পড়াশোনার কোনও সুযোগই ছিল না সেখানে। বিবাহের পর সাংসারিক কাজকর্ম নিয়েই থাকতে হয়েছে তাঁকে। দক্ষিণেশ্বরে যখন এসে থেকেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটি সর্বদা ধর্মালোচনায় মুখরিত থাকলেও শ্রীশ্রীমা এসব থেকে দূরে জনান্তিকে, নহবতের অপরিসর ঘরে তাঁর নিত্যদিনের সংসারের কর্তব্যভার নিয়ে দিনযাপন করে গেছেন সানন্দে। তাই বড় বিস্ময় লাগে যখন শ্রীমার মুখ থেকে সূত্রাকারে জ্ঞানগর্ভ বাণীগুলি স্ফুরিত হতে শুনি—যা ব্রহ্মসূত্রকে মনে করিয়ে দেয়। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, মা কোথা থেকে জানলেন এসব কথা। মা কোনও ভক্তকে সাধন প্রসঙ্গে বলেছেন, ''সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, (শ্রীশ্রীমার মধ্যে) তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি।'' মা বলতে চাইছেন, সাধনার অগ্রগতির মাপকাঠি হল একাত্মতাবোধ, যা অদ্বৈততত্ত্বের সারকথা। আমরা সাধারণভাবে সাধনায় অগ্রগতি বলতে কিছু শারীরিক প্রকাশকেই বুঝি, যেমন ভক্তিবিশ্বাসের আধিক্য, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক। শ্রীমা কিন্তু এসবের ধার-কাছ দিয়েও গেলেন না, সাধনার একেবারে 'চরম সুর'টি যেন বেঁধে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন ওইস্থানে পৌঁছনোর লক্ষ্যেই সাধককে অগ্রসর হতে হবে।

শ্রীশ্রীমা তাঁর জীবনান্তকালীন যে-জ্ঞানবাণীটি, অন্নপূর্ণার মাকে উপলক্ষ্য করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন, সেটি তো একটি 'masterpiece'। ''যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'' এই বাক্যের প্রথম অংশটি জীবনে শান্তিলাভের শর্ত, দ্বিতীয় অংশটি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ বা চরম কথা। মানবজীবনে সুখ নয়, শান্তিই দুর্লভ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্থ দিয়ে কেনা যায়, কিন্তু মনের শান্তি মনের প্রসন্নতালাভের ওপর নির্ভর করে। অপরের প্রতি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নিজ দোষত্রুটি না দেখে অন্যের দোষদর্শন মনকে বিক্ষিপ্ত, বিচলিত করে, মনের শান্তি হরণ করে ও তাকে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। এ থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, নিজের দোষত্রুটিগুলি একটু বিশেষ করে, বড় করে দেখলে, অন্যকে আর দোষান্বিত মনে হবে না এবং এই দিক থেকে বিচার করে যদি জগতের সকলকে ভালবাসা যায়, আত্মার আত্মীয় ভাবা যায়, তবে জগতে আর পর বলে কেউ থাকে না, অশান্তিও লুপ্ত হয়। তখন 'একাই কর লীলা'। অদ্বৈত বেদান্তের এই পরম ঘোষণা : ''নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।''

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে এই অদ্বৈতচেতনাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। স্বামী বিবেকানন্দের মতে জগতকে ব্রহ্মভাবে দর্শনই শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন। শ্রীসারদা সরস্বতীকে দেখছি প্রথম থেকেই এই সুমহান বিশ্বচেতনায় স্থিত থেকে, এইসব জ্ঞানময় মণিমুক্তোগুলি আমাদের জন্য ছড়িয়ে রেখে গেছেন। কবির ভাষা অনুসরণ করে বলা যায়, এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণি-সরস্বতীর নাচদুয়ারে।